দৈনিক ইত্তেফাক
ডকুমেন্টেশন
তারিখ 05 APR 1989

চতুরঙ্গ

সুহৃদ

আজ দেশের শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছে। তবে তার আগে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না,—সালমান রুশদীর প্রসঙ্গ। সম্প্রতি প্রবীণ সাংবাদিক আলহাজ্ব শামসুল হুদা রুশদীর 'শেম' উপন্যাস সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। উপন্যাসটি আমার সংগ্রহে ছিল, এতোদিন পড়া হয়ে ওঠেনি। তাঁর (হুদা ভাই) লেখা পড়ে বইটি আদ্যোপান্ত পড়লাম এবং নিঃসন্দেহ হলাম যে, রুশদী কোনো লেখক নয়। কথাশিল্পীর অভিধা তাকে দেওয়া চলে না। দেওয়া চলে না, কারণ শিল্পী হতে গেলে যে ন্যূনতম মহত্ব, ন্যায়বোধ এবং পরিমিতিবোধ থাকা দরকার, তার সেটা নেই। লোকটা একেবারেই জাত-বেয়াদব। তার মানসিক অসুস্থতা, বিকৃতি ও বিকারের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। পাগলা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করা স্বভাব, বিনা কারণে কামড়াতে ছুটে আসে। 'শেম' উপন্যাসের ১৭৯ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কথাগুলি সে লিখেছে, সেই কথাগুলিই তার সম্পর্কে আমার উল্লেখিত মন্তব্য পুরো মাত্রায় প্রতিপন্ন করে। রুশদী লিখেছে :···East wing, that festering swamp, populated by whom ? O Savages, breeding endlessly, jungle bunnies good for nothing but growing jute and rice, knifing each other, cultivating traitass in their paddies···

রুশদী সম্পর্কে এ পর্যন্তই। ঘৃণা ও ধিক্কার তার প্রাপ্য, এই জিনিস পেয়েছেও মাত্রাতিরিক্ত। তার কথা বলে লেখার জায়গা আর চিন্তার স্বস্তি নষ্ট করতে চাই না। কুকুর মানুষকে কামড়াতে পারে, কুকুরকে কামড়ানো তো মানুষের শোভা পায় না।

যে বিষয়ে লেখার ইচ্ছে সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। শিক্ষা ও শিক্ষা পরিবেশ। দুটোরই 'মাশাল্লাহ' এমন কাহিল চেহারা যে, উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিবেশে অবক্ষয়ের সূচনা হয়তো ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী আমল থেকেই। কারণ সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে পরিকল্পিত উপায়েই ছিল ঔপনিবেশিক ছাঁচে তৈরী। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয়, ঔপনিবেশিক বলে যত গায়ের ঝালই ঝাড়ি, সেই আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ভয়াবহ নৈরাজ্য ছিল না। এমন স্থূল আর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ছিল না। ব্যবস্থার পরতে পরতে টাকা ও অস্ত্রের এমন সুসংবদ্ধ (Well-knitted) খেলা ছিল না। সৎ ও যোগ্য শিক্ষকের দেখা পাওয়া এমন বিরল ও ব্যতিক্রম ঘটনা ছিল না। ছিল না শিক্ষাঙ্গনে আইডিয়ার এমন দুর্ভিক্ষ। নকলের এমন মহামারী। এসবেরই বাড়াবাড়ি স্বাধীনতার পর থেকে।

স্বাধীনতার পর খুলে দেওয়া উচিত ছিল আইডিয়ার দরজা। দেওয়া হয়নি বরং সময়ানুক্রমে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় হীনমন্যতা, পশ্চাদগ মিতা এবং সঙ্কীর্ণ চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে—শিক্ষা ও সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যবোধসমূহ যাতে আরো উজ্জীবিত হয়, উচিত ছিল স্বাধীনতার পর সেই চর্চা অবারিত ও উৎসাহিত করা। দুর্ভাগ্য, তা হয়নি। বহু ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সবকিছুর ওপর স্থান পেয়েছে। স্বাধীনতার পর উচিত ছিল শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে ঢেলে সাজানো—যাতে সৎ ও যোগ্য শিক্ষক তাদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন, অসৎ ও অযোগ্য শিক্ষক হন তিরস্কৃত ও দণ্ডিত। উচিত ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে ঢেলে সাজানো—যাতে পরীক্ষায় নকলের কোন সুযোগই না থাকে। উচিত ছিল, শিক্ষা পরিবেশকে রাজনৈতিক স্বার্থ, দলাদলি ও যাবতীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে রাখা। দুঃখের বিষয়, এই সবের কোনটিই হয়নি। স্বাধীনতার পর শিক্ষাঙ্গনে যা হয়েছে, যা ঘটেছে, যা হচ্ছে যা ঘটছে,—সবই অস্বস্তিদায়ক, জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক, দেশের ভবিষ্যতের জন্য চরম উদ্বেগজনক।

শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিবেশ সম্পর্কে এই ধরনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা নানা মহল থেকে নানাভাবে প্রকাশ করা হয়ে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। খুব একটা কাজ হয়েছে এমন বলা যায় না। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করাই সার,—সমস্যা যা ছিল তা বরং সময়ের ধারায় জটিলতর হয়েছে।

বিষয়টি আলোচনার আগে গত শুক্রবার (৩১শে মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের একটি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। ঐদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিছু ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারকে কালো পতাকা দেখায়। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু বিরূপ শ্লোগান দেয়। তাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা খানিক ক্ষুণ্ণ হয় বটে। আমি আরো কয়েকজনের সাথে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম এবং অনুভব করছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে তরুণ প্রাণের তাজা উচ্ছ্বাস। কালো পতাকা দেখানো এবং বিরূপ ধ্বনি তোলার ঘটনা থেকে আমারও মনে হয়েছিল একটা হৈহৈ মারামারি না বেধে যায়। ক্যাম্পাসে তো এই 'ঐতিহ্যে'র কোন কমতি নেই—ঘাটতি নেই। কিন্তু দেখলাম কালো পতাকা দেখানো এবং বিরূপ ধ্বনি দেওয়া পর্যন্তই ঘটনা শেষ। যেমন সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে এসে একদল ছেলে কালো পতাকা দেখাল এবং বিরূপ ধ্বনি দিল, তেমনি দলবদ্ধভাবে তারা আবার ফিরেও গেল। বুঝতে অসুবিধে হল না, কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে ছাত্রসমাজের একটা অংশের ক্ষোভ আছে। আছে তাদের কিছু দাবী। সে কারণেই প্রতিবাদের অংশ হিসাবে তারা দেখিয়েছে কালো পতাকা, তুলেছে বিরূপ শ্লোগান।

যে-কোন গণতান্ত্রিক সমাজে এই ধরনের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ হতেই পারে—হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে উঠে একজন বক্তা দেখলাম বেশ উষ্মা প্রকাশ করলেন ছাত্রদের এই কালো পতাকা দেখানো এবং বিরূপ শ্লোগান দেওয়া নিয়ে। দুঃখ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, এই ধরনের (কালো পতাকা দেখানো ও বিরূপ শ্লোগান দেওয়া) ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জানি না, এই দুঃখ প্রকাশ কিসের নমুনা। কী তার অর্থ। তবে এইটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ জানানো সম্পূর্ণভাবেই গণতান্ত্রিক রীতি। সেই দিকের বিচারে উল্লেখিত ঘটনাটি কোনক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। বরং প্রতিবাদী ছাত্রদের দেখে সেদিন উপলব্ধি করেছি যে, প্রতিবাদের বেলায় গণতন্ত্রের ভাষা কি হওয়া উচিত, তা তারা জানে এবং বোঝে। সীমা লংঘন এবং বাড়াবাড়ি হয়নি। সেই বক্তাই বরং খামোখা উত্যক্তবোধ করেছেন।

ক্যাম্পাসে এক ধরনের উচ্ছৃংখল ও সন্ত্রাসী ছেলে আছে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, সব শিক্ষালয়ে আছে, সংখ্যায় তারা দিন দিন বাড়ছে এটাও সত্য। তবে এই নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাসের পেছনে কারা আছে তা জানতে পারলে আর যা-ই হোক, উচ্ছৃংখলতা ও সন্ত্রাসের জন্য ছেলেদের এককভাবে দায়ী করা যায় না। মাস কয়েক আগে দৈনিক বাংলার এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু অব্যবস্থা, যা কিছু নৈরাজ্য, উচ্ছৃংখলতা এবং সন্ত্রাস, তার পেছনে বেশীর ভাগই দায়ী ভুল শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্তৃপক্ষের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, এক শ্রেণীর শিক্ষকের (তারাই শিক্ষকদের মধ্যে গরিষ্ঠ অংশ) অযোগ্যতা, অ-শিক্ষকোচিত আচরণ ও তৎপরতা এবং অতি অবশ্যই বাইরের রাজনীতির হস্তক্ষেপ, টাকা এবং অস্ত্র। সমীক্ষাটি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহী ছিল। তাতে সংখ্যাতত্ত্ব এবং তত্ত্ব-প্রমাণ উল্লেখ করে বলা হয়, সেশন-জট, পরীক্ষা পিছানো, ফল প্রকাশে দেরী হওয়া ইত্যাদির জন্য কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অযোগ্য অসৎ শ্রেণীটাই শতকরা নিরানব্বই ভাগ দায়ী।

কোন কিছু হলে শিক্ষার্থীর 'কান মলে দেওয়া' আমাদের চিরকেলে অভ্যাস। কান মলে দিতে না পারলে দোষ-অপবাদ ইত্যাদি চাপিয়ে দেই। কালো পতাকা দেখাবার ব্যাপারটাও কিছুটা তেমনি। শিক্ষার্থীদের হয়ে উঠেছে 'যত দোষ নন্দঘোষ।' এইখানে বলে রাখি, শিক্ষার্থীদের একটা শ্রেণী আছে যারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত কারণেই হয়তো বেয়াদব, উচ্ছৃংখল এবং সন্ত্রাসী হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর ছেলে যে-কোন অভিভাবকের জন্য বোঝা এবং লজ্জা বৈ আর কিছু নয়। যে-কোন সমাজের, জন্য এই শ্রেণীর ছেলে দায়-ভার। এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর ছেলেদের ব্যাপারে দুঃখ ও ক্ষোভ জানিয়ে পাশাপাশি আমরা শুধু এটা বলব যে, বহু ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ছেলের ভুল মানসিক-গঠন ও ভুল শিক্ষার জন্য কার্যতঃ আমরাই দায়ী। কখনো বাড়ি ও চারপাশের পরিবেশ, কখনো বাবা-ভাই বা অভিভাবকের উদাসীনতা, কখনো বা সমাজের ভুল শিক্ষা ও ভুল দৃষ্টান্ত এই শ্রেণীর ছেলেকে হতাশা আর সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্ততঃ তা-ই। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা হয়, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহার, সেটা তো সকলেরই জানা।

যা-কিছু দোষ, তা নন্দঘোষ তথা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপালে শিক্ষা ও শিক্ষা-পরিবেশে বিরাজমান সমস্যা কোনদিনই দূর করা যাবে না। তাকাতে হবে মুক্ত-দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা পরিবেশের গভীরে। ডিগ্রী-সর্বস্ব এই শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। পাল্টাতেই হবে। অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষাকে করতে হবে বৃত্তিমূলক। অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে ছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষালাভের কোনই প্রয়োজন নেই। আমাদের নূতন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে বটে, তবে বি,এ, এমএ পাস করার জন্য নয়—দেশের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগর, প্রযুক্তিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, নার্স একাউনটেন্ট, প্রশাসক, সাংবাদিক ইত্যাকার পেশাজীবী তৈরী করার জন্য। দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার এবং সমাজের সচেতন অংশ ব্যাপারটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণভাবে নিচ্ছে না। ফলে, শিক্ষার ভিত্তি যেমন ছিল সাধারণ (general), তেমনি থেকে গেছে, সেই ভিত্তি এতদিনেও বৃত্তিমূলক করা যায়নি। আমরা মনে করি, এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শিক্ষা যাতে বৃত্তিমূলক হয়, তজ্জন্য এখন থেকেই তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

আর দরকার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা। সিলেবাস এমন হবে—যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-বোধ মোটামুটি একটা সম্পূর্ণতা ও বিশেষ বিষয় বা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব অর্জন করতে পারে। পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার—যাতে নকলের কোন সুযোগই না থাকে। যাতে শিক্ষার্থী তার মুখস্থ করা বিদ্যা উগলে দেওয়ার বদলে অর্জিত ও অধীত জ্ঞান পরীক্ষার খাতায় প্রকাশের সুযোগ পায়।

পাকিস্তান লাভের পর গেছে ২৪ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গেছে ১৮ বছর। কত সরকার, কত শিক্ষামন্ত্রী, কত রকম কমিশন দেখলাম। কেউ কি স্বাধীন দেশের এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি? কেউ কি বোঝেননি, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি নকলবাজিকে ডেকে আনতে বাধ্য?

এই প্রশ্ন রাখছি। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জবাব কে না জানেন? কে না জানেন, শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের বদলে মুক্ত চিন্তার উল্টোদিকে অবস্থান নেওয়ারই তোড়জোড় চলে বেশী? শিক্ষা-পরিবেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করার চাইতে সন্ত্রাসীদের নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখারই প্রচেষ্টা বেশী? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন কালো মেঘ। প্রজন্ম ধরে যেন কোন প্রলয় বার্তা তৈরী হয়ে চলেছে। এই অবস্থার কথা ভাবতেও ভয় হয়। কষ্ট হয়। বারান্তরে এই বিষয়ে আরো একটু বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছে রইল।